ভারতবর্ষে বিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের প্রভাবে মানবাধিকার সংক্রান্ত ইস্যুটি ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এটা হয়েছে প্রধানত ১৯৭৫-৭৭ সালের জরুরি অবস্থার নিষ্পেষণমূলক সরকারি অবস্থানের পর থেকে। ওই সময় জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারটি ভীষণ ভাবেই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এই সময় নাগরিক অধিকার, সংবাদপত্র, রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতির ওপর অবাঞ্ছিত নিয়ন্ত্রণ, সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাচার প্রভৃতির যৌথ প্রভাবে সারা ভারত জুড়ে সৃষ্টি হয় এক অগণতান্ত্রিক পরিবেশ। এই সময় ব্যাপকভাবে নির্বিচারে দেশের বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়েছে, সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ এবং চোরাচালন ও মজুতদারী প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কফেপোসা (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities–COFEPOSA), অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন (Maintenance of Internal Security Act–MISA) ইত্যাদি আইনের চূড়ান্ত অপব্যবহার করা হয়। ফলস্বরূপ গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ওপর অকথ্য আক্রমণ নেমে আসে। এর প্রতিবাদে গোটা ভারতবর্ষব্যাপী মানুষের মনে ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

দিল্লিতে জোর করে নিরন্ন গরীব মানুষদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হয়। জরুরি অবস্থার অপর একটি খারাপ দিক হল গণ নির্বীর্যকরণ (mass sterilisation)। বলপূর্বক আটক, আটক ব্যক্তিদের ওপর অত্যাচার, জেল বন্দি অগুনতি মানুষের হাহাকার হয়ে দাঁড়ায় ওই সময়ের সাধারণ চিত্র। পরবর্তী কয়েক দশকে ঘটেছে একাধিক কৃষক আন্দোলন, আদিবাসী আন্দোলন, দলিত আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন এবং পরিবেশ আন্দোলন। এই আন্দোলনগুলির প্রত্যেকটি মানবাধিকার আন্দোলন। হাজার হাজার মানুষ এইসব গণতন্ত্র-বিরোধী সরকারি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য রাস্তায় নামে। গণতন্ত্রের জন্য ওই সময় একাধিক সংগঠন গড়ে ওঠে— যেমন, People's Union for Civil Liberties (PUCL), People's Union for Civil liberties and Democratic Rights (PUCLDR), Chhatra Yuba Sangharsh Vahini। এইসব সংগঠনগুলি জাতীয়স্তরে মানবাধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে আন্দোলন চালায়। এছাড়া রাজ্যস্তরে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে, উদাহরণ স্বরূপ Committee for

Protection for Democratic Rights (Mumbai), Association for Protection of Democratic Rights (APDR), Andhra Pradesh Civil liberties Committee (APCLC) in Hyderabad প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। শ্রমিক, কৃষক, দলিত, মহিলা, আদিবাসী প্রভৃতি সমস্ত নির্যাতিত মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে যোগ দেয়।

ভারতে মানবাধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংগঠিত বেশ কয়েকটি আন্দোলনের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, চিপকো আন্দোলন, মাদক দ্রব্য ব্যবহার প্রতিরোধমূলক সংগঠনসমূহ, ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, মিজো ও নাগাদের আন্দোলন ইত্যাদি। এইসব সংগঠন নিরলসভাবে মানবাধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে প্রধানত পুলিশ বাহিনী, সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী, প্রাধান্যকারী জাতি ও শ্রেণিসমূহের দ্বারা। মধ্যপ্রদেশের হাইকোর্টে একটি হেফাজতি ধর্ষণের মামলার রায়দান কালে মুখ্য বিচারপতি মন্তব্য করেছিলেন, "ভারতবর্ষের পুলিশ দেশের সব থেকে সংগঠিত গুন্ডাবাহিনী (মৈত্রীয় চট্টোপাধ্যায়, **রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও মানবাধিকার**, পৃষ্ঠা ৫২৩)। যাই হোক এই সমস্ত সংগঠন পুলিশ বাহিনী, সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী, অন্যান্য সরকারি সংস্থা, প্রাধান্যকারী শ্রেণি ও জাতিসমূহ কর্তৃক যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে তার সরেজমিনে তদন্ত করে, যারা মানবাধিকারের শিকার হচ্ছে তাদের সঙ্গে কথা বলে। কখনও তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে গণ-মাধ্যমগুলির সাহায্যে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করে, কখনও বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সমূহ পার্লামেন্ট, বিধানসভা, সংবাদপত্র, বৈদ্যুতিন মাধ্যম প্রভৃতি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালায়। আন্দোলন, মিটিং-মিছিল, ধর্না, গণস্বাক্ষর, প্রতিবাদপত্র প্রেরণ প্রভৃতি উপায় ও পদ্ধতির-মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের সমস্যাগুলি সমাধানের উদ্দেশ্যে বিচারবিভাগে জনস্বার্থবাহী মামলা-মোকদ্দমা (PIL) করা হয়। এছাড়া মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের স্বার্থে বড়ো বড়ো জনসভাও মানবাধিকার সংগঠনগুলি অনেক সময় করে।

অধিকাংশ মানবাধিকার রক্ষা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিবেদন পেশ করে। এই সমস্ত প্রতিবেদনে নাগরিকদের সমস্যাদি, তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় অবিচার, নিপীড়ন সম্পর্কিত বহু তথ্য থাকে। যেমন কত শিশু শৈশব অবস্থাতেই কাজে লেগে পড়ে, তারা কিভাবে নিয়োগকারীর দ্বারা নির্যাতিত ও শোষিত হয়, পণ-প্রথা, ইভটিজিং, ধর্ষণ ইত্যাদি কারণে কত নারী নির্যাতিত হচ্ছে প্রতিদিন, কত মানুষ পুলিশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, কত বন্দির পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু হচ্ছে এই সমস্ত বিষয়গুলিকে তুলে ধরে এবং নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেয় এর প্রতিকারের আশায়। বস্তুত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ও তার প্রতিকারের বিষয়ে এই সমস্ত সংগঠনের আন্দোলন ও প্রচার মানবাধিকারের সুরক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা নেয়।

ভারতে মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনগুলির একটি রূপরেখা :

নারী আন্দোলন :

অধ্যাপক **রাম আহুজা** (Ram Ahuja) তাঁর Social Problems in India গ্রন্থে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন:

(১) **দৈহিক নির্যাতন**— ধর্ষণ, অপহরণ, খুন ইত্যাদি;

(২) **পারিবারিক নির্যাতন**— পণপ্রথা সংক্রান্ত মৃত্যু, স্ত্রীকে প্রহার, যৌন অত্যাচার, বিধবা ও বয়স্কা মহিলাদের প্রতি অমানবিক ব্যবহার ইত্যাদি;

(৩) **সামাজিক নির্যাতন**— ইভটিজিং, স্ত্রীলোককে পারিবারিক সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করা, যুবতী বিধবাকে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে বাধ্য করা ইত্যাদি।

দুঃখের বিষয়, ভারতে নারীর বিরুদ্ধে যে অত্যাচার সংঘটিত হয় তার খুব সামান্য পরিমাণই প্রকাশ্যে আসে।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ভারতীয় নারীর মধ্যে যে আন্দোলনের মনোভাব দেখা যায়, স্বাধীনোত্তরকালে সেই মনোভাবে কিছুটা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। কারণ হিসেবে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে (AIWC) বলা হয়,

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরের বছরগুলিতে ভারতের মহিলারা রাজনীতির কঠিন জায়গাটি পরিত্যাগ করে আগের মতো 'সেবার' আদর্শে ফিরে যান। যাই হোক এই যুগের কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল : (১) জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ডাক, (২) জরুরি অবস্থার নারী স্বাধীনতার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগঠিত বেশ কয়েকটি নারী আন্দোলন, (৩) 'মথুরা ধর্ষণ মামলা' চলাকালীন বিভিন্ন নারী আন্দোলন ইত্যাদি। মহারাষ্ট্রে স্বামীদের মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান ও স্ত্রী প্রহারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে ছোটো ছোটো মহিলা শিবির গড়ে তোলা হয়। ১৯৮০-র দশক থেকে ভারতে নারীদের রাজনৈতিক তৎপরতা ও সাংগঠনিক কাজকর্ম বিপুলভাবে বেড়ে যায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য নারী সংগঠন গড়ে ওঠে, যাদের কাজ হল নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, চাকরি, মজুরি ও সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সমতা অর্জনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া।

শিশু নির্যাতন : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) মতে গোটা বিশ্বে ৩০ কোটি শিশুর শৈশব 'বিক্রি' হয়ে গেছে। অল্প মজুরিতে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে তারা। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিবেদন থেকে থেকে জানা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধে, গৃহযুদ্ধে, জঙ্গিমূলক কাজ কর্মে ৪ লক্ষ ছেলে-মেয়ে (১৮ বছরের নীচে) সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িত। জাতিপুঞ্জ আরও জানিয়েছে, ২০০০ থেকে ২০১০ এই দশ বছরে যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে ৩০ লক্ষ শিশু নিহত হয়েছে। ৮০ লক্ষ শিশু চিরদিনের মত কর্ম-ক্ষমতা হারিয়েছে এবং অনাথ হয়েছে ২০ লক্ষ শিশু। এরই পাশাপাশি বিভিন্ন মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি শিশুদেরও সন্ত্রাসবাদে নিয়োজিত করার কাজ শুরু করেছে। বহু কিশোরের কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে বন্দুক। এছাড়া শিশুদের দিয়ে দেহবিক্রি এখন বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে একটি লোভনীয় ব্যবসায় দাঁড়িয়েছে। Operation Research Group, Boroda কর্তৃক পরিচালিত একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে ২০০৫-এ ভারতে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৩০ লক্ষ। এর দুই-তৃতীয়াংশের বয়স ১২ থেকে ১৫-এর মধ্যে, বাকিদের বয়স ১২-র নীচে। শিশু শ্রম বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারতে শিশু শ্রম (নিষিদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৬ সালে Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 প্রণীত হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি হয়নি, বরং পরিস্থিতি উত্তরোত্তর অবনতির দিকে যাচ্ছে।

এই অকল্পনীয় পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ভারতে তথা বিশ্বে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য আন্দোলন সংগঠিত হয়নি। Child Prostitution in India, Operation Research Group, Amnesty International জাতীয় কতকগুলি সংস্থা বিষয়টির বিরুদ্ধে ছোটো-খাটো আন্দোলন চালিয়েছে, সভা-সমিতি গঠন করেছে। কিন্তু এতে অবস্থার এতটুকু পরিবর্তন হয়নি।

পরিবেশ আন্দোলন : ভারতে পরিবেশের উত্তরোত্তর অবনতিকে রোধ করার উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলি মূলত তিন ধরনের— (১) শিক্ষা মূলক, (২) উন্নয়নমূলক এবং (৩) প্রতিরোধমূলক। **শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি** মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে ইকো-ক্লাব গঠন করে, পরিবেশ নিয়ে গবেষণা চালায়, পরিবেশ সংক্রান্ত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে, সেমিনার বা কর্মশালার আয়োজন করে। **উন্নয়মূলক সংস্থাগুলির** কাজ হল আধুনিক উন্নয়নের জারজ সন্তান হিসেবে পরিবেশ সমস্যা সম্পর্কে জনগণের সচেতন করা এবং একই সঙ্গে উন্নয়নের বিকল্প পথের সন্ধান দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, 'উত্থান' (Utthan)-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা জনগণকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে, বনসৃজনের উপকারিতা সম্পর্কে, সৌর শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে এবং উৎসাহ দেয়। **প্রতিরোধমূলক সংগঠনগুলির** কাজ হল পরিবেশ সংক্রান্ত কাজ করতে গিয়ে স্থানীয় মাতব্বর, রাজনীতিবিদ এবং আমলাদের কাছ থেকে যেসব বিরোধিতা আসে সেগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও প্রতিবাদ সংগঠিত করা। সাম্প্রতিকালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু পরিবেশ আন্দোলন গড়ে উঠেছে, যেমন— চিপকো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, তেহরী আন্দোলন, চিল্কা আন্দোলন ইত্যাদি।

চিপকো আন্দালন : ভারতে পরিবেশ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে ১৯৭৩ সালে চিপকো আন্দোলনের মাধ্যমে। ওই অঞ্চলের স্থানীয় জনসাধারণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় যে তাঁরা যেন কোনো কারণে অরণ্য

সম্পদ নষ্ট না করেন। অথচ কাঠের ব্যবসায়ীদের বনের গাছ কাটতে ঢালাও অনুমতি দেওয়া হয়। এছাড়া পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসে চোরা কারবারীদের মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে ওঠে বনাঞ্চলগুলি। এই সবের প্রতিবাদে চিপকো আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৭৮ সালে আন্দোলন জমে ওঠে। আন্দোলনের দুই নেতা সুন্দরলাল ও চন্ডীপ্রসাদ পুলিশের হাতে বন্দি হন। বহুক্ষেত্রে এই আন্দোলনের সম্মুখভাগে ছিলেন মহিলারা। চিপকো আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্ন আন্দোলন ছিল না। গারওয়ালের চাষিরা দীর্ঘদিন ধরে বনসম্পদের ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আসছিল। শ্রীরামচন্দ্র গুহ-র মতে, চিপকো আন্দোলন হল সেই দীর্ঘ মেয়াদি কৃষক আন্দোলনের একটা সরব পরিণতি (eloquent phase)।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন : নর্মদা নদীর ওপর সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে আছেন মেধা পাটকার (Medha Patkar) এবং বাবা আমতে। আন্দোলনকারীদের মতে, এই প্রকল্পটি হল বিশ্বের সর্ববৃহৎ পরিকল্পিত পরিবেশ ধ্বংসের প্রকল্প। এই প্রকল্পে তিন হাজারেরও বেশি ছোটো-বড়ো বাঁধ নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্পের ফলে ২৪৩টি গ্রাম জলমগ্ন হবে। এই প্রকল্প রূপায়িত হলে পরিবেশের ভারসাম্য তো নষ্ট হবেই, উপরন্তু অসংখ্য গরিব কৃষক ও উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায় পরিবেশজনিত উদ্বাস্তুতে (ecological refugees) পরিণত হবে। অথচ ধনী চাষি এবং গৃহনির্মাণ ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট লাভ হবে।

নিম্নজাতিভুক্ত **শ্রেণির আন্দোলন :** ভারত একটি জাতিভেদ অধ্যুষিত দেশ। ভারতবর্ষে, বিশেষত ভারতের গ্রামীণ সমাজে এখনও জাতিভেদ প্রথা, হরিজন নিগ্রহ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি বিদ্যমান। এখনও সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ণ হিন্দুদের প্রাধান্য-প্রতিপত্তি বহুলাংশে বিদ্যমান। এখনও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নিম্নবর্ণ তথা হরিজন সম্প্রদায়ের লোকেরা উচ্চবর্ণের লোকদের দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার-অবিচারের শিকার হচ্ছেন। মুখে প্রগতিশীল কথাবার্তা বললেও সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষেরা এখনও পর্যন্ত জাতিভেদ প্রথাকে সযত্নে লালন করে চলেছেন। নির্বাচনের সময় প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে, নির্বাচনী প্রচারে, মন্ত্রীসভার সদস্য নিয়োগে জাতপাতের বিষয়টিকে প্রাধান্য পেতে দেখা যায়। তবে ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে এই জাত ব্যবস্থার কঠোরত কিছুটা শিথিল হতে আরম্ভ করল। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সুবাদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জাতপাত, ধর্ম ও বর্ণ নির্বশেষে প্রতিটি ভোটদাতার গুরুত্ব অনুভব করতে আরম্ভ করে। এই ভোটাধিকারই নিম্ন জাতির তথা হরিজনদের রাজনীতেতে গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলল, কারণ নির্বাচনি লড়াইয়ে জয়লাভ করতে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হলে এই শ্রেণির মানুষের একান্ত প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে নিম্ন জাতিভুক্ত ভোটদাতাগণ কোনো দলের অনুগ্রহপ্রার্থী নয়; বরং রাজনৈতিক দলগুলিই তাদের অনুগ্রহ প্রার্থীতে পরিণত হল। তবে জাত ব্যবস্থা এখনও নির্মূল হয়নি। গ্রামীণ ভারতের অধিকাংশ অংশে এখনও নিম্নজাতিভুক্ত মানুষেরা শোষিত ও অত্যাচারিত হয়ে চলেছে এবং বিভিন্ন জাতিভিত্তিক সংগঠন (Caste organisation) গঠন করে উচ্চবর্ণ তথা প্রভাবশালী শ্রেণির শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের আন্দোলন : নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার দাবিতে, বাসভূমি ও অরণ্যসম্পদ ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার দাবিতে, বর্ণ হিন্দুদের প্রাধান্য ও শোষণের অবসানের দাবিতে, সংরক্ষিত অঞ্চল অথবা স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবিতে এবং আরও নানা দাবিতে ভারতের আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলন, বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের সামিল হয়েছে। কখনও এইসব আন্দোলন শান্তিপূর্ণ পথে এগিয়েছে, আবার কখনো-বা হিংসাত্মক আকার ধারণ করেছে। কে.এস.সিং (K.S. Singh) আন্দোলনগুলিকে প্রাধনত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেন, যথা— (১) রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে আন্দোলন (Movement for Political autonomy), (২) কৃষি ও অরণ্যভিত্তিক আন্দোলন (৩) সংস্কৃতায়ন আন্দোলন (Sanskritization Movement) এবং ভাষা ও লিপিভিত্তিক আন্দোলন। এল.পি.বিদ্যার্থী (L.P. Vidyarthi) একটু অন্যভাবে আন্দোলনগুলিকে ভাগ করেছেন, যথা— (i) প্রতিক্রিয়াশীল (Reactionary), (ii) রক্ষণশীল (Conservative), সংশোধনমূলক (Revisionary) এবং (iv) বিপ্লবাত্মক (Revolutionary)। প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের লক্ষ্য হল আগের দিনে ফেলে আসা রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে ফিরিয়ে আনা। আর রক্ষণশীল আন্দোলনের লক্ষ্য হল স্থিতাবস্থা বজায় রাখা

এবং যে-কোনও প্রকার পরিবর্তনের বিরোধিতা করা। বিরসা মুন্ডা, সিধু ও কানুদের বিদ্রোহ ছিল প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের। সংশোধনমূলক আন্দোলনের লক্ষ্য হল উপজাতীয় জীবন ধারাকে এমনভাবে পরিবর্তন বা সংশোধন করে নিতে যাতে তারা হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। উপজাতি জনগোষ্ঠীর হিন্দু জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার এই উদ্যোগকে সাধারণভাবে হিন্দুত্বকরণ প্রক্রিয়া (Hinduanization) বলা হয়। আন্দোলনের চতুর্থ ধারাটি অর্থাৎ বৈপ্লবকি আন্দোলনে প্রচলিত সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে খোলনলচে বদলে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক সমাজ কাঠামো গড়ে তুলতে চায়। নাগাল্যান্ডের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক পরিষদ (National Social of Council) পরিচালিত চরমপন্থী আন্দোলন এই চতুর্থ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

দলিত আন্দোলন : ভারতে প্রতি ৬ জন পিছু একজন দলিত সম্প্রদায়যুক্ত। এরা আইনের চোখে অস্পৃশ্য নয়, কিন্তু বাস্তবে তারা অস্পৃশ্যই থেকে গেছে। এই অস্পৃশ্য শ্রেণির মধ্যে উল্লেখ হল চামার, মুসাহার, ভুইয়া, ধোবি, ডোম, হালালকার, পরিয়ানস, পালনস, মেহার, বলসি, মেঘাল ইত্যাদি। এই অস্পৃশ্য দলিত শ্রেণির মানুষদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না এবং সামাজিক জীবনের অতি নিম্নস্থানে এদের অবস্থান। এদের কোনো জোতজমি নেই, ঘরবাড়িও তেমন নেই; তারা জীবিকা অর্জন করে অন্যের জমিতে কাজ করে। দলিতদের উন্নতির জন্য সরকার কর্তৃক যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে (যেমন সংরক্ষণ) সেগুলি ব্যবহার করে অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষদের কিছুটা অর্থনৈতিক অবস্থায় উন্নতি ঘটেছে, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এখনও তারা পশ্চাদ্‌বর্তী অবস্থানে রয়েছে। নানারূপ অত্যাচার, নিপীড়ন, সামাজিক অমর্যাদা প্রভৃতির বিরুদ্ধে দলিত শ্রেণি বহু আন্দোলন করেছে এবং এখনও করছে। গান্ধীজী, আম্বেদকর প্রমুখ নেতৃবর্গ এই শ্রেণির মানুষদের উন্নতির জন্য প্রাণপাত করেছেন। তবে যতদিন না তারা শিক্ষিত চেতনাসম্পন্ন হচ্ছে, ততদিন তাদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে না। **সচ্চিদানন্দ** বলেছেন, দলিতদের অবস্থার পরিবর্তনে তিনটি উপাদান খুবই জরুরি : (১) এই অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ, (২) দলিতদের নিজেদের মধ্যে চেতনার বিকাশ এবং (৩) বর্ণ হিন্দুদের আর একটু উদার মনোভাব।

উপসংহার : এ পর্যন্ত ভারতে মানবাধিকার আন্দোলনের দু-একটি নমুনা তুলে ধরা হল। এছাড়াও ভারতে বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সম্পর্কিত সংগঠন রয়েছে। এইসব সংগঠন সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের ঘটনাসমূহকে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রচার চালায় এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের শাস্তির ব্যাপারে সক্রিয় থাকে। তবে ভারতে মানবাধিকার শক্তিশালী হয়নি। তাই সবক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহের বিরুদ্ধে সফল আন্দোলন গড়ে উঠতে দেখা যায় না। তবে সাম্প্রতিককালে ভারতে মানবাধিকার আন্দোলনের অবস্থা আগের মতো হতাশজনক ও নৈরাশ্যমূলক নয়। মানবাধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একদিকে সরকারের ওপর বিশ্বজনমতের চাপ রয়েছে, অন্যদিকে ভারতীয় জনমতেরও চাপ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের বিচার বিভাগ স্বাধীন ও শক্তিশালী। ভারতীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতাও রয়েছে। এই ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়ে ভারতের বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ শাসন ও আইন বিভাগীয় হস্তক্ষেপের হাত থেকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে এবং এখনও করছে। এছাড়া ভারতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (National Human Rights Commission) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটিও মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে।